ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1315-1320
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.135

‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসের আলোকে বিরসা, বিরসাইত ও উলগুলান: একটি নিবিড় পর্যালোচনা

সঞ্জীব হাঁসদা, *সহকারী অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

‘Aranyer Adhikar’ is the famous novel of Mahasweta Devi. The novel was published in 1977. This novel depicts the tribal struggle against British rule. Birsa Munda is the main character of this novel. This novel describes the life of Birsa Munda and the context of the uprising led by him. This novel has twenty chapter and one conclusion. The novel is written in the center of the Birsa Munda uprising. Birsa died in police torture after being arrested for rebellion. The novel ended up with the death of Birsa. However, the history of Birsa's ancestors in the entire novel, Birsa's birth, childhood, adolescence and rebellion, etc. have been fully discussed.

Birsa was born on Thursday. That's why his name was named Birsa. Because this is the custom in the Munda society. He is the son of Sugana Munda. His mother's name is Karami. He could play the flute and Twilla from an early age. They were extremely poor. They adopted Christianity to avoid this poverty. After the coming of the British government, the indigenous Munda began to be expelled from his own homeland and agricultural land. They protest but do not get justice. Birsa decided that he would overthrow the British government. Birsa calls for struggle. The name of that struggle is ‘Ulgulan’. In the struggle, Birsa and ‘Birsaite’ forces were defeated. But this rebellion has raised many questions in civilized society.

Keywords: Munda society, Birsa, Birsait (follower or disciple of Birsa), Leader or chief, Nomad or wanderer, Mission (usually refers to Christian missionary work) British (the English), Outsider (non-tribal or non-indigenous person, often used pejoratively in tribal context), Landlord or Zamindar, Forced or unpaid labor (begar system), Customary tribal village self-rule or traditional administrative system

> “অজ্ঞান বিরসা, অজ্ঞান, কিন্তু সব জানতে পারছে ও, সব দেখতে পাচ্ছে ছবির পর ছবি। মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন। কোন না কোনভাবে ভাত বিরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।” [১]

বিরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস ‘অরণ্যের অধিকার’ আসলে সকল মুণ্ডা জাতির ইতিহাস। অরণ্য অধ্যুষিত ছোটনাগপুরের পাহাড়ি কালো কালো মানুষগুলির একদা ইংরেজ শাসক ও রাজা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা ইতিহাসের পাতায় উল্লেখিত আছে ‘মুণ্ডা বিদ্রোহ’ (১৮৯৯) নামে। এর নেতৃত্বে ছিলেন বিরসা মুন্ডা। মুন্ডা বিদ্রোহ সূচিত হয় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপনের পর। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ক্যামাককে ইংরেজ সরকার পাঠালেন পার্লামেন্টের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। তিনি ছোটনাগপুরের নিজেদের আধিপত্য

কায়েম করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠল ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট রাখা। ফলস্বরূপ আদিবাসী প্রজাদের উপর চাপালেন অত্যধিক করের বোঝা। ক্যাপ্টেনের দোসর হলেন স্থানীয় জমিদারগণ। এমন দ্বিমুখী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ছোটনাগপুরের তামার গ্রামের মুণ্ডারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হলেন এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের দমন করতে সক্ষম হলেন। মুণ্ডা বিদ্রোহীরা সংগ্রাম থেকে বিরত থেকে দিন যাপন করলেও তাদের মনে ইংরেজ ও জমিদারদের প্রতি ক্ষোভ তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকে। ছোটনাগপুর, সিংভূম, মানভূম এবং জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ পরিব্যপ্ত এলাকায় জঙ্গলের নিজস্ব সম্পদ আদিবাসীদের জীবনধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য।[২] চাষযোগ্য জমি হস্তক্ষেপের পর জঙ্গলে উৎপাদিত দ্রব্য গুলির ওপর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নজর পড়তে থাকে ইংরেজ শাসকের। উভয়বিধ কারণে জল, জঙ্গল ও জমিনের উপর থেকে মুণ্ডা আদিবাসীদের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। ফলে মুণ্ডা দের এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয় ইংরেজ সরকার। অরণ্য মুণ্ডা দের মা, আর দিকুরা মুণ্ডা দের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে।[৩] অস্তিত্বে লড়াইয়ে কোণ ঠাসা হয়ে যাওয়া মুণ্ডারা বাঁচার শেষ অবলম্বন হিসেবে জঙ্গলকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানেও ঘটে পরাজয়।

মুণ্ডাদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারে সহযোগী হয়েছে দিকুরা। তারা মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে নিজস্ব ভিটে মাটি থেকে। মুণ্ডাদের যে প্রাচীন খুটকাট্টি[৪] গ্রাম ব্যবস্থা পুরুষানুক্রমে বহমান ছিল তা ভেঙে চুরমার। জমি - জেরাত ভিটে মাটি বেহাত হল। দিকুরা সব দখল নিল। সঙ্গে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো যুক্ত হল বেঠবেগারী[৫] অর্থাৎ বাধ্যতামূলক শ্রমদান। মুণ্ডা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে ইংরেজ, জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি, অন্যায় - অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ এবং শোষণ। জল জঙ্গল জমি পাহাড় থেকে জন্ম সূত্রে পাওয়া মুন্ডারী দুনিয়া থেকে মুণ্ডারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের ও নিজের পরিবারের বাঁচার তাগিদে তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হল। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এইভাবে বাস্তু ত্যাগ করে চলে যায় ১২৩৬৯ জন। তার মধ্যে মুণ্ডা ৩৯৮৬, ওরাওঁ ১০৫৮ এবং ভূঁইয়া ১৫৪৬ জন।[৬] এইভাবে অত্যাচার চরণে ওঠে।

বিরসার জন্মকাল নিয়ে দ্বিমত থাকলেও তার জন্ম ১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে। পিতা মাতার সংসারে বিরসারা পাঁচ ভাই বোন। জীবনের প্রতি পদে পদে অভাব আর অনটন। বাইরের এক বৃহৎ শক্তি যেন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাহাড় জঙ্গল ঘেষা জায়গায় বসতি গড়ে। আবার তারা উচ্ছেদ হয়। জীবন জীবিকা সবই দোদুল্যমান। জীবন বাঁচার তাগিদে বিরসা সহ পরিবারের সকলে খ্রিস্টান ধর্মে আশ্রয় নেয়। জীবন রক্ষা পেলেও রক্ষা পায় না, জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতি। খ্রিস্টান হতে পারলে খাবার জুটবে, জমিও বেদখল হবেনা, সেই সঙ্গে মিলবে মিশনে পড়াশোনা করার সুযোগ। এই হাতছানিই বিরসা গ্রহণ করে। কারণ সে অভাব জানতো, তার মা করমির দুঃখ বুঝত। সে জানত তাকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। তার থেকেও বড় কথা দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত থেকে জমি বাড়ি বাঁচাতে পারবে।[৭] কিন্তু ভাবনাকে মাটির জগতে বাস্তবায়িত করা বেশ দুষ্কর। পাঠানো হলো তাকে গাইচরীর কাজে। বিরসার শারীরিক গঠন যেন অন্যরকম। মুণ্ডা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খাপ খায় না। তার চালচলন একবারে ভিন্ন রকম। বিরসা জানে সে খুশিতে নেই। চারদিকে উন্মুক্ত বনাঞ্চল আর পাহাড়। চোখ বাধে না কিছুতেই। কিন্তু তবু যেন মনে হয় জীবন বড় আবদ্ধ হয়ে গেল।[৮] তবে আবদ্ধ থাকেনি বিরসা। মেসোর বাড়িতে গাইচরীর সামান্য ভুল যেন আশীর্বাদ স্বরূপ নেমে এলো ভাগ্য তাকে টানলো মুণ্ডারী জগতের বাইরে।

এরপর লুকাস প্রচারকের সহায়তায় বুরজুর জার্মান মিশন। সেখানে লোয়ার প্রাইমারি পাস করে ভর্তি হল চাইবাসা মিশন। এখান থেকেই বিরসার জীবনের পট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। মুণ্ডাদের জীবন ভবিষ্যৎ ও ভবিতব্যও যে মিশন থেকে নির্ধারিত হয় তা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে বিরসা। মিশনের সাহেব আর সাহেব সরকার সব এক।[৯] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুণ্ডারা সাহেব সরকারকে চিঠি লিখে আর্জি পেশ করে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দেও আর্জি জানায়। আর ১৮৮১ তে মুন্ডারা মিশন ছেড়ে দেয়। ১৮৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিশন ও সর্দারদের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এখান থেকেই প্রতিবাদী বিরসার উত্থান।

অসহায় মুণ্ডাদের বাঁচানোর জন্য কঠিন সংকল্প নেয় বিরসা। নিজেকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করে সে। কেননা বিরসা এই সত্য অনুধাবন করেছিল নিজেকে ভগবান অর্থাৎ ধরতি আবা হিসেবে তুলে না ধরলে মুণ্ডাদের মনে জায়গা নেওয়া যাবে না। ফলে মুণ্ডারী সমাজের চোখে নিজেকে ধরতি আবা বলে চিহ্নিত করে। সে তার মাকে জানিয়েছে – “আমি ভগবান মাগো। আর তোর কোলে মোরে ধরবে না, আটকাবে না। আমি এই ধরতি আবা।”[১০] ধরতি আবা হয়ে

বিরসা সমগ্র মুণ্ডা সমাজকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর। যে কঠিন নাগপাশ ঘিরে আছে মুণ্ডাদের কে তার ছেদন দরকার। তার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। সে মুণ্ডাদের ছেলে ভুলাবেনা কোলে দুলাবে না। সে সকল মুণ্ডা দের জন্য জঙ্গল মাটি ছিনিয়ে এনে দেবে।

বিরসাতে আস্থা রেখেছে মুণ্ডারা। রুগ্ন, খঞ্জ, অন্ধ সবাই দেখতে যায় বিরসাকে। ধরতি আবা'র বিশ্বাসকে সংস্কার আবদ্ধ করার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ নেয় বিরসা। কারণ সে ভাল করেই জানে শুধু ধরতি আবা হয়ে মানুষের মনে জায়গা নেওয়া যাবে না। তাই মুণ্ডাদের মনের বদ্ধমূল ধারণাকে দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে এই উপায়ে ,-

১. কাটুই নামক গ্রামে কলেরা লেগেছিল। বিরসা তাদের চিকিৎসার নিদান দেয়। রোগীকে আলাদা রাখার কথা বলে। জল সিদ্ধ করে খেতে বলে। বাসি পচা খাবার খেতে বারণ করে। নদীর পাথরে বাঁধা জল ছেড়ে দেয়।। আপাং গাছের শিকড় বেটে খেতে বলে। গ্রাম কলেরা মুক্ত হয়।
২. গায়ে চেচক লেগেছে। বিরসা, নিম পাতা সিদ্ধ করে জল পান করতে বলেছে। নিম জলে গা মুছতে বলেছে। সাদা তুলসী পাতার রস, আদার রস মিশিয়ে খাওয়াতে বলেছে। রোগীদের করোলা পাতা আর হলুদের রস মিশিয়ে খেতে বলেছে। কেউ মারা গেলে কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে বলেছে । তারপর সত্যিই গ্রাম থেকে বসন্তের মহামারী লোপ পায়।তার মা করমি বলে, -

> "বিরসা! তুই সাঁচাই ভগবান হচ্ছিস বাপ? চেচক হয় কিন্তুক বিশ পঞ্চাশটা টা মুণ্ডা মরেনা, এ তো আমার জীবনকালে দেখি নাই?'
> বিরসা বলল, এত মানুষের মাঝে আমি তোর বিরসা নইরে মা ! আমি ধরতি আবা।
> ... ধরতি আবাই হচ্ছিস।
> ... ভগবান হয়ে এসেছি। তোমাদের পথ দিশাব। তা বাদে চলে যাব। দিকুরা আমার ক্ষমতা দেখে বশ না মানলে মুণ্ডারা বাঁচবে না মনে জানলাম।"[১১]

এরপরে বিরসা অন্য ভূমিকা পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ এতদিনে যা যা করেছে ও তার পিছনে আছে বিগত ছয় সাত বছরের অভিজ্ঞতা। সে শুনতে পেয়েছে অরণ্য জননীর কান্না। অরণ্য মাটি বাপ দাদাদের ছোটনাগপুর দিকুদের থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে ভেবেছে সর্দার আন্দোলনের কথা। সর্দারদের আন্দোলন মানেই তো শুধু আর্জি জানানোর আন্দোলন। একটা সময় সর্দাররা সকলে তার সঙ্গে সামিল হয়েছে। বিরসার দিকে হাত বাড়িয়েছে মাংগা মুণ্ডা, জন মুণ্ডা, মাটিন মুণ্ডার মত সর্দাররা। সর্দাররা বিরসার অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করেছে। বিরসার উপর তাদের অগাধ আস্থা। তাই বিরসা সর্দারদের কাজে লাগাতে চেয়েছে। সে তার আন্দোলন এবং সর্দারদের আন্দোলন এক করে লড়াই করতে চেয়েছে। আর এই লড়াইয়ে সে হয়েছে নেতা। মুণ্ডা রাজের ডাক দিয়েছে বিরসা। সে রাজে সকল বিদেশিদের তাড়াতে চেয়েছে।

মিশনের সাহেবরা বিরসাকে নিয়ে চিন্তিত। বিরসার প্রভাব মুণ্ডাদের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে মিশনারীরা ভাবিত। তারা বিরসার মনোভাব ও গতিবিধির উপর নজর রেখেছে। তাদের মনে প্রশ্ন, বিরসা কিসের পুনর্জন্ম চাইছে? আদিম ধর্ম বিশ্বাসের না বিদ্রোহের ? মিশনারীদের বুঝতে সমস্যা হয়েছিল কারণ ১৮৩১ - ৩২ খ্রিস্টাব্দের দিকে তামারে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তা মূলত ছিল সর্দারদের অসন্তোষ। এবং সেই অসন্তোষ শুধুমাত্র দিকুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন বিরসা সর্দারসহ সকল মুণ্ডাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে পেরেছে যে মিশন সাহেব সরকার ও দিকু জমিদার মহাজন। সকলে মুণ্ডাদের শত্রু। সে বলেছে, "জমিদার মহাজন ও বেনে যে মুণ্ডাদের শত্রু একথা বলবে ও মুণ্ডাদের।"[১২] সে বার্তা প্রেরণ করে এবার থেকে মুণ্ডা ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। সকল রকম দিক থেকে বিরসা আজাদি হতে চেয়েছে। দিকুদের কাছে মুণ্ডারা যে ধার কর্জ জেল আদালত রেল কয়লা খাদে বাঁধা পড়েছে সেখান থেকে মুক্তি দেবে। ডাক দেয় বিদেশি বিতাড়নের। খাজনা দেওয়া মুলতবি রাখে। আর সকল বন অধিকার করে নেবে। সে তৈরি করে বিরসাইত বাহিনী।

শুরু হলো বিদ্রোহের প্রস্তুতি। সম্মুখ সমরে নামার আগে বিরসাদের সব রকমের অসহযোগিতা। সরকার ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। মুণ্ডারা চাষাবাদ বন্ধ করে দিয়েছে। টাকা ধার নেয় না মহাজনদের কাছ থেকে। ধান কম ধার নেয় না। জমি বাঁধা রাখে না। বিরসা মুণ্ডাদের মনে যুগিয়েছে অসীম দুঃসাহস। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের

৬ই আগস্ট ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে দারোগা দুজন কনস্টেবলকে পাঠায় বিরসাকে গ্রেফতার করতে কিন্তু মুণ্ডারা কনস্টেবলদের তাড়িয়ে দেয়।

সাহেব সরকারের আইন মুণ্ডাদের জন্য নয় বরং মুণ্ডা বিরোধী। তাদের তৈরি আইনের সাহায্যে মুণ্ডারা জমি ঘর বাড়ি গাই বলদ সব হারিয়েছে। তাদের দেশে জুড়ে বসেছে অন্যরা। মুণ্ডা ভবিষ্যৎ কি তা সহজে অনুমান করতে পারে বিরসা। প্রথম যে বারে তাকে গ্রেফতার করতে পুলিশ যায় তারপর থেকে চলছে অশান্তি আর বিক্ষোভের আগুন। চালকাড়, রাঁচি,খুনটি,তামার, বন্দগাঁও, কোচাং জ্বলতে লাগলো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। তবুও প্রদেশ সরকার সন্দিহান। কারণ মুণ্ডাদের একটি বিশ বছরের ছেলেকে বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করে সরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিমলায় বড়লাটকে জানায়-

> "সরকার কিন্তু এ কথা মনে রাখবেন, সরকার বারুদের পিপের ওপর বসে আছেন। সে কথা সিমলায় জানাজানি
> হতে শৈলবাসে হাসির ধুম পড়ে গেল। বারুদের পিপে ! কেন, মুণ্ডারা কি জীবন্ত বারুদ নাকি? ওই তো দেশ।
> পাথর, পাহাড়, জঙ্গল আর আফলা মাটি। ফসল ফলে শুধু মুণ্ডাদের হাসিল করা অরণ্যভূমিতে। প্রয়োজনের তুলনায়
> তাও অপ্রতুল। কি একটা সুজলা সুফলা দেশ! কি তাদের অধিবাসীরা! প্রায় নগ্ন, গায়ের রং কয়লার চেয়ে কালো,
> একবেলা ঘাস দানা সেদ্ধ করে খায়, শরীরে বল নেই, ভীতুর বেহদ্দ। তাদেরই ভয় করছে প্রদেশ সরকার?"[১৩]

১৪ই আগস্ট পুলিশের ২০ জন লোক পুনরায় বিরসা কে গ্রেপ্তার করতে যায়, কিন্তু গ্রামের পাহান ও মুণ্ডারা বীরসাকে গ্রেফতারের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। ১৬ই আগস্ট বিরসা মুণ্ডারাজের কথা ঘোষণা করে বলে যে সরকারি রাজ খতম হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সরকার। প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ জন লোক ধামসা মাদল বাজিয়ে তীর ধনুক নিয়ে পুলিশের পশ্চাদগামী হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে আগস্ট বিরসা কে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয় ।

কমিশনারের ইচ্ছে সকল মুণ্ডাদের সম্মুখে বিচার সভা বসিয়ে বিরসাকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করার। ভগবান তো নয়ই, প্রমাণ করা যাবে সে একজন ঠগ প্রতারক অশিক্ষিত সাধারণ মুণ্ডা। সুপারিনটেনডেন্ট এর আদেশে ২০ জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়ে খুনটি রওনা হয়। রেভারেন্ড লাসটি পুলিশ অফিসার এবং জগমোহন সিং ২০ জন সশস্ত্র পুলিশ জঙ্গলে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে চাল কার পৌঁছান। খুনটির সাব ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকে বিরসাকে গ্রেফতার করেন।

বিরসার গ্রেফতারের খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ছোটনাগপুরের আকাশে বাতাসে। কর্নেল গডন রাতের আঁধারে দেখলেন দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সারি সারি আলোর মিছিল। পরের দিন বিচার হবে বিরসার। কিন্তু বিচারে মুণ্ডাদের ভাবগতিক দেখে কোন ফয়সালা হয়নি। প্রচন্ড গোলমালে বিচার বন্ধ হয় এবং বিরসাকে রাঁচিতে স্থানান্তর করে। সেখানে মুণ্ডারী নবিশ কালী কৃষ্ণ মুখার্জীর এজলাসে বিচার হয়। তিনি মুণ্ডাদের পক্ষে রায় দেওয়ায় কমিশনার সাহেব ডেপুটি বাবুকে বদলি করেন। নতুন ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে বিচার হয়। সেই বিচারে বহু ধারায় বিরসা দোষী সাব্যস্ত হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে নভেম্বর বিরসার দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই সঙ্গে অন্য মুণ্ডাদের ২০ টাকা করে জরিমানা ও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মহান ব্যক্তির উপর অবিচার করলে প্রকৃতি পরিবেশ বিরূপ হয়। বিরসার কারাবন্দীতে সৃষ্টি জ্বলে পুড়ে খাক। পরপর দু বছর অনাবৃষ্টি। বিরসার অনুপস্থিতিতে সালী, ডোনকা ও ধানী মুণ্ডারা বিরসাইতের প্রচার কার্য চালাতে থাকে। বিরসা মুক্তি পায়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে মুক্তি পেল সে। আর এ খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়তেই মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে মাদল বাজতে লাগলো। মুণ্ডা মেয়ে পুরুষেরা নাচ গান করল। পুলিশি পাহারায় তাকে চালকাড় পাঠানো হয়। রাঁচি থেকে চালকাড় ফেরার পথে সে লক্ষ্য করে চারিদিকে সব শুকনো শুষ্ক। সৃষ্টি জ্বলে খাক। মুণ্ডাদের অনাহার উপবাস দারিদ্র্য মনে পাষাণ হয়ে চেপে বসে। বিরসা কমিশনারের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আর মুণ্ডাদের প্রস্তাবে না কিন্তু সে অনুভব করে এমন পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব নয়।

> "এখন মনের কোথায় যেন প্রতি ধ্বনিতে শুকনো, রুক্ষ বাতাসের প্রতিধ্বনিতে ফিরে এলো মায়ের কাছে শোনা, প্রাচীন গৌরবের কথা। চুটিয়া জগন্নাথপুর নওরতনে মুণ্ডারা মন্দির গড়েছিল। সে মন্দিরে পাথরের বেদির নিচে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সিং বোঙার সঙ্গে কথা বলা চলত। ঈশ্বর আর মুণ্ডারা সেদিন বড় কাছাকাছি ছিল। তারপর মা বলত, তারপর স-ব নিয়ে নিল দিকুরা। মুন্ডারা বেদখল হয়ে গেল।"[১৪]

মাথার উপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তির খাঁড়া। শর্ত মতে জেল মুক্তি। তবুও সন্ধ্যায় বিরসার বাড়ি মুণ্ডা সর্দাররা এক আলোচনা সভা বানিয়ে ফেলে। এক একজন করে মুণ্ডাদের ওপর শোষণ ও অত্যাচারের কথা জানায় বিরসাকে। বিরসা জানে তাকে ছাড়া গতি নাই মুণ্ডাদের, মুণ্ডারাও তাই। বিচক্ষণ বিরসা নিজেদেরকে শত্রু চিনে নিতে বলে। সকলকে বিরসাইত ধর্মে এনে লড়াইয়ের পাঠ শেখায়। তার লড়াইয়ে নবীন প্রবীন সকলকে সমান প্রয়োজন। বিরসাইতদের বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। তাদের পুরাতন দেবথানের দখল চায়। তাদের আদি রাজধানী নওরতনগড়ের কেল্লা দখল চায়। তাদের যা কিছু পুরাতন বেদখল হয়ে গেছে দিকু জমিদারদের কাছে আজ সবকিছু কেড়ে নেবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সকলে। সকল মুণ্ডা সকল দেশ জুড়ে একসঙ্গে লড়বে। আর এই লড়াইয়ের নাম হলো 'উল গুলান।'[১৫]

মুণ্ডাদের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য এক নতুন পন্থা অবলম্বন করে বিরসা। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখার জন্য দল তৈরি করে সে। সভা করে আসন্ন অভিযানের কথা শোনায়। বিরসাইতদের পরণে সাদা ধুতি এবং হাঁটু অবধি ঝুলিয়ে পড়া। তারা প্রথমে চুটিয়া যাবে। সেখানে তাদের পিতা পুরুষ পূর্তি মুণ্ডা চুটিয়া সিং বোঙাকে পুজো দিতে বেধি তৈরি করেছিল, তা দখল নিয়েছে রাজা রঘুনাথ। সে মন্দির থেকে তিল তুলসি নেবে। সেখান থেকে জগন্নাথপুর। ৩০০ বছর আগে ঠাকুর আইনীশাহী মন্দির তৈরি করেছিল মুণ্ডাদের দেব থানে। মন্দির থেকে চন্দন নিয়ে সকলে তিলক পরে। তারপর বাকি নও রতনগড়। সেখান থেকে মাটি আনলেই মুণ্ডা মনে আত্মজাগরণের পালা শেষ। তারপর বিরসা জানায় মাটি সংগ্রহ হয়ে গেলেই শুরু হবে উলগুলান অর্থাৎ মহা সংগ্রাম।

এই মহা সংগ্রামের মূল ঘাঁটি নির্বাচন করে বিরসা বোর্তোদি গ্রাম। জঙ্গলের বুকে পাহাড় ঘেরা জায়গা সেটি। পুলিশের পক্ষে পৌঁছানো সেখানে অসাধ্য। বিরসা একের পর এক সভা করে লড়াইয়ের পথ বলে দেয়। একটা কথা পরিষ্কার যে, বিরসা কোন মুণ্ডাকে জোর করে লড়াইয়ের ময়দানে আনেননি বরং দিকে দিকে সভা করে উৎসাহ জুগিয়েছে। সেই সভা গুলোতে মুণ্ডা অধিকার নিয়ে বুঝিয়েছে এবং সেই অধিকার ছিনিয়ে নিতে তাদেরই মত নিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখিকা বলেছেন,-

> "মুণ্ডাদের জীবন থেকে সব বাইরের আগাছা উপড়ে ফেলা দরকার। জাতির যারা শত্রু,
> কি অর্থনীতিতে, কি ধর্মে, তাদের বহিষ্কার করা দরকার।"[১৬]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস সিম্বুয়া পাহাড়ে সভা করে বিরসা। সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূর কুশ পুতুল দাহ করে তারা। বিরসা সদর্পে ঘোষণা করে ব্রিটিশ রাজত্ব খতম করা হলো। মন্দাদরী মহারানীর কুশপত্তলিকা দাহ করা হলো। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ডোমবারি পাহাড়ে আবার সভা হয় সোহরাই পরবের আগে। এই সভাতেই দিকুদের রক্তে পতাকা রাঙিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভের কারণে ইউরোপিয়ান ক্লাব সহ অফিস কাছারিতে আনন্দের উৎসব চলছে। ইংরেজ সহ দেশি চাকর বেয়ারারা মদ্যপানীয়তে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নিচ্ছে। সেই সময় বিরসাইতরা শহরে তীর চালিয়ে আক্রমণ শানায়। ডিসি তড়িৎ গতিতে বেরোলেন। কোন তীর সন্ধানী মুণ্ডার দেখা পাননি। ডিসি এবং পুলিশ সুপার খবর নিয়ে জানলেন সিংভূম জেলার চক্রধরপুরের প্রতিটি থানায় খবর আছে তীর ছুটেছে এবং আগুন জ্বলেছে।

ক্যাপ্টেন রোশ বিরসার দলবলকে ধরতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দুমকা ও চুঁচুড়া থেকে সৈন্যবাহিনী রাঁচির দিকে অগ্রসর হয়। ৬ই জানুয়ারি ডেপুটি কমিশনার নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ৭ই জানুয়ারি বিদ্রোহীরা খুনটি আক্রমণ করে। খ্রিস্টান সহ সকলে পালাতে থাকে। খুনটি থানার পুলিশ অফিসাররা থানা থেকে পালিয়ে যায়। বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট দল খুনটি আক্রমণের পরের দিনে সেখানে পৌঁছান। ডোরন্ড সেনাবাহিনী কমান্ডিং অফিসার ১৫০ টি রাইফেল ধারী সৈন্য খুনটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাঁচি পুলিশকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কারণ সৈল রাকাব পাহাড়ে বিরসাইতদের বিশাল সমাবেশের কথা পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে। রাঁচির কমিশনার বিশাল পুলিশ বাহিনী সৈল রাকাবের দিকে এগিয়ে যায় এবং সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেলে।বিরসাইতরা বুঝতে পারে পুলিশ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেছে। তখন তারা তীর ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ বাহিনীও গুলি চালাত আরম্ভ করে বিরসাইতদের ওপর। বিদ্রোহী বিরসাইতরা তীর ও পাথর দিয়ে আক্রমণ শানায়। বহু মুণ্ডা নারী-পুরুষ হতাহত হয়। অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে উপন্যাসে মেলে ,-

> "২০ জানুয়ারির দা ইংলিশ ম্যান কাগজ বলেন, সরকারি মুখপাত্ররা হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে নীরব। গুজব, ১৫ থেকে ২০ জন নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা বেশি হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু মুণ্ডারা জঙ্গলে পালায়, সেখানেও মরে, এই রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে সঙ্গীদের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে গোপনে সমাধি দেয়।'
>
> ২৫ শে মার্চ দা ইংলিশ ম্যান কাগজ বলেন, অন্তত ৪০০ মুণ্ডা নিহত হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত করা হোক।' •••
>
> ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল পুলিশ ইন্টেলিজেন্স লেখেন, সর্দাররা বলছে ৭০০ মুণ্ডা নিহত।
>
> দ্য স্টেটসম্যান আবার লেখেন ৪০ জন নিহত। রেফারেন্ড হফম্যান বলেন শুধু কুড়িজন নিহত।"[১৭]

সৈল রাকাব অপারেশনের পর বিদ্রোহী মুণ্ডাদের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ১১ই জানুয়ারি ফবস খুনটিতে মুণ্ডাদের সাথে কথা বলেন। তারপরেই ১৩ ই জানুয়ারি থেকে পুনরায় বাকি বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করতে অভিযান চালায়।

বিরসা ধরা পড়েনি। পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী গ্রামে গ্রামে বিরসাকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। বিরসাইতদের গ্রাম লুঠ করে ধানের শেষ কণা পর্যন্ত নিয়ে যায় ইংরেজ অফিসাররা। ১৯ দিন ধরে বিরসা সহ কয়েকজন বিদ্রোহী পুলিশ ও মিলিটারির চোখে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর একসময় সর্দাররা ধরা পড়ে কিন্তু বিরসাইতদের ধরার জন্য সাঁড়াশি অভিযান চলে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ২৮শে জানুয়ারি ডনকা ও মাঝিয়া ৩২ জন সঙ্গীসহ আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীতে তেসরা ফেব্রুয়ারি বিরসা ধরা পড়ে। ক্লান্ত বিরসার মাথায় ছিল বিরাট পাগড়ী এবং দেহ আবরণ হীন। এরপর বিচারের দোষী সাব্যস্ত হয়। স্থান হয় রাঁচি জেল। জেলে থাকাকালীন দীর্ঘ রোগ ভোগের পর নয় জুন তাঁর নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে। রক্ত বমি করে বেলা ন ঘটিকায় মারা যায়। বিরসার মৃত্যুর সাথে সাথে এক অশ্রু সজল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

১. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃষ্ঠা ১৭।
২. সেন, শুচিবব্রত। পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা ২২।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃষ্ঠা ১৮।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩।
৬. মন্ডল, ড. চিত্ত, ড. প্রথমারায় মন্ডল। বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (সম্পা.)। একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬৬।
৭. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃষ্ঠা ৩৮।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৬১।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৬।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৬।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৯০।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১২২।
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৩।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৭।